#আমি পদ্মজা পর্ব ২
#ইলমা বেহরোজ

_____
বাড়িটা মোড়ল বাড়ি নামে পরিচিত। পদ্মজার দাদার নাম ছিল মিয়াফর মোড়ল। তিনি গ্রামের একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। ছয় কাঠা জমির উপর টিনের বিশাল বড় বাড়ি বানিয়েছিলেন চার ছেলের জন্য। দুই ছেলে ষোল বছর আগে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। দুজনই টগবগে যুবক ছিল। আর একজন আট বছর বয়সে কলেরা রোগে গত হলো। বাকি রইল মোর্শেদ মোড়ল। বর্তমানে এই

বাড়ি মোর্শেদের অধীনে। যদিও তিনি থাকেন না সবসময়। পুরো বাড়ির চারপাশ জুড়ে গাছগাছালি। বাড়ির পিছনে নদী। রাত নয়টা বাজলেই পরিবেশ নিশুতি রাতের রূপ ধারণ করে। রাতের এই নির্জন প্রান্তর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে ছেয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার সাথে পদ্মজার ভাঙ্গা কান্না মিলেমিশে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, কোনো আত্মা তার ইহজীবনের না পাওয়া কোনো বস্তুর শোকে এমন মরা সুর ধরেছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে পাশে বসান। পদ্মজা ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে হেমলতাকে বলল,

‘মামা সৌদিতে যাওয়ার আগের দিন আমাদের সবার দাওয়াত ছিল না নানাবাড়ি? খালামণি, ভাই-বোনেরা এসেছিল। সেদিন ঢাকা থেকে যাত্রার লোক আসছিল স্কুলে মনে আছে আম্মা?’

‘আছে।’

উঠোনে ধপ করে একটা আওয়াজ হয়। হেমলতা,পদ্মজা কেঁপে উঠল। পূর্ণা, প্রেমা দরজায় কান পেতে রেখেছিল মা-বোনের কথা শুনতে। হুট করে কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হওয়াতে দুজন ভয় পেয়ে যায়। দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে রুমে ঢুকে পড়ে। হেমলতা

বড় মেয়ের সাথে গোপন বৈঠক ভেঙে দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। উঠানে বিদ্যুৎ নেই। হারিকেন জ্বালান। পিছনে তিন মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন মায়ের তিন মেয়ে নিয়ে একা এতো বড় বাড়িতে বাস করাও যুদ্ধ বটে! হেমলতা গলা উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন,

‘কে? কে ওখানে?’

‘আমি।’

চির পরিচিত এই কণ্ঠ চিনতে হেমলতার বিড়ম্বনা হলো না। তিনি ব্যস্ত পায়ে উঠোনে নেমে আসেন। গেইটের পাশে মোর্শেদ মোড়ল পড়ে রয়েছেন। গায়ে চাদর। হাঁপড়ের মতো

বুক উঠা-নামা করছে তার। যেন দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। হেমলতা দু'হাতে মোর্শেদকে আঁকড়ে ধরলেন। পদ্মজা,পূর্ণা, দৌড়ে আসে। মোর্শেদের এমফাইসিমা রোগ আছে। এ রোগে অল্প চলাফেরাতেই শ্বাসটানের উপক্রম হয় এবং দম ফুরিয়ে যায়। শ্বাস নেবার সময় গলার শিরা ভরে যায়। তিন মা-মেয়ে মোর্শেদকে ধরে রুমে নিয়ে আসে। মোর্শেদ এভাবেই হুটহাট করে বাড়ি ফেরে। কখনো কাকডাকা ভোরে, কখনো নিশুতি রাতে বা কখনো কাঠফাটা রোদে।

মোর্শেদ মোড়লেই এমফাইসিমা রোগটা ধরা পড়ে সাত বছর আগে। মোর্শেদের অ্যাজমা ছিল। আবার ধূমপানে খুবই আসক্ত ছিলেন। ফলে ফুসফুসের এই রোগটি খুব দ্রুত আক্রমণ করে বসে। মোর্শেদ খানিকটা সুস্থ হয়ে রাত একটার দিকে ঘুমালেন। পূর্ণা, প্রেমা রুমে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। পদ্মজা বারান্দার রুমে ঝিম মেরে বসে আছেন। জানালার বাইরে চোখের দৃষ্টি। জোসনা গলে গলে পড়ছে! কি সুন্দর দৃশ্য! পদ্মজার মন বলছে, মা আসবে তাঁর খোঁজে। পুরোটা ঘটনা শুনতে

আসবেই। সত্যি তাই হলো। কিছুক্ষণ পরই হেমলতা আসলেন।

‘আম্মা, বাতিটা নিভিয়ে দাও।’ বলল পদ্মজা। কণ্ঠ খাঁদে নামানো। হেমলতা বাতি নিভিয়ে পদ্মজার পাশে বসেন। পদ্মজা তৈরি ছিল তবুও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। সে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পদ্মজা তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। বয়স দশ ছিল। খুব কম বয়সেই তাকে স্কুলে পাঠানো শুরু করেন হেমলতা। সেদিন, নানাবাড়িতে সবার দাওয়াত পড়ে। হানিফ চলে যাবে সৌদিতে। তাই এতো আয়জন। পরিবারের মিলন আসর

বসে। স্কুল মাঠেও সেদিন নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির সবাই সেখানেই চলে যায়। বাড়িতে থাকে শুধু পদ্মজা, পদ্মজার বৃদ্ধ নানা, আর হানিফ। পদ্মজা ঘুমে ছিল তাই বাকিদের সাথে যেতে পারেনি। যখন ঘুম ভাঙে আবিষ্কার করল বাড়িতে কেউ নেই। মোর্শেদ হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়াতে হেমলতা বাপের বাড়িতে উপস্থিত ছিল না।

‘ পদ্ম নাকি?’

পদ্মজা বাড়ি থেকে বের হওয়ার উপক্রম হতেই কানে আসে হানিফের ডাক। পদ্মজা মিষ্টি করে হেসে মাথা

নাড়াল। হানিফের লোলুপ দৃষ্টি তখন পদ্মজার সারা শরীর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইটুকু মেয়ের ফর্সা চামড়া বিকৃত মস্তিষ্কের হানিফকে যেন বড্ড টানে!

‘আয় তো, আমার ঘরে আয়।’

সহজ সরল শিশুসুলভ পদ্মজা মামার ডাকে সাড়া দিল। সে শুনেছে, মামা-ভাগনে যেখানে আপদ নেই সেখানে। অথচ, সেদিন সে মামাকেই ঘোর বিপদ হিসেবে জানল।

পদ্মজা রুমে ঢুকতেই হানিফ দরজা লাগিয়ে দিল।পদ্মজার মন কেমন করে উঠে হানিফের অদ্ভুত চাহনি আর দরজা লাগানো দেখে। হানিফ কুৎসিত

অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করতে থাকে। পদ্মজার দেখতে খুব খারাপ লাগছে। ভয় করছে।

‘ এদিকে আয় তোর লগে গল্প করি।’

হানিফ বিছানায় বসে পদ্মজাকে কাছে ডাকে। পদ্মজা কাছে যেতে সংকোচ বোধ করে। হানিফ পদ্মজার ডান হাতে ধরে টেনে কোলে বসায়।

‘ তুই জানোস? তুই যে সবার থাইকা বেশি সুন্দর?’

হানিফের প্রশ্ন পদ্মজার কানে ঢুকেনি। সে মোচড়াতে থাকে হানিফের কোল থেকে নামার জন্য। আপত্তিকর স্পর্শ

গুলো পদ্মজার খুব খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

‘মোছড়াস ক্যান রে ছেড়ি। শান্তিমত বইয়া থাক। মামা মেলা থাইকা সাজনের জিনিষ কিইননা দিমু।’

হানিফ শক্ত করে দু’হাতে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। পদ্মজা কিছুতেই নামতে পারছে না।

‘মামা, আমি চলে যাব।’ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল পদ্মজা।

‘কই যাবি? মামার ধারে থাক।’ বলল হানিফ।

হানিফের শক্তপোক্ত হাতের স্পর্শগুলো শুধু অস্বস্তি দিচ্ছে না,স্পর্শকাতর

জায়গাগুলো ব্যাথায় বিষিয়ে উঠছে। পদ্মজা কেঁদে উঠে। ভেজা কণ্ঠে বলল,
‘ বাড়ি যাব আমি। ব্যাথা পাচ্ছি মামা।’

হানিফ হাতের বাঁধন নরম করে আদুরে গলায় বলল,
‘ আচ্ছা, আর ব্যাথা দিতাম না। কান্দিস না।’

পদ্মজা চট করে কোল থেকে নেমে পড়ে। হানিফকে তার আজরাইল মনে হচ্ছে। মায়ের কাছে সে আজরাইলের অনেক গল্প শুনেছে। আজরাইল যখন জান নিতে আসবে তখন শরীরে খুব কষ্ট অনুভব হবে। এই মুহূর্তে যেন ঠিক তেমনই অনুভূতি হলো। তাহলে তার

হানিফ মামাই আজরাইল। পদ্মজা দরজা খুলতে পারবে না। তাই হানিফকে ভীতিকণ্ঠে অনুরোধ করল, ‘ মামা দরজা খুলে দাও।’
‘ক্যান? আমি তোরে যাইতে কইছি?’

হানিফের কর্কশ কণ্ঠের ধমকে পদ্মজা ভয়ে কেঁপে উঠল। তার চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে। হানিফ পদ্মজাকে জোর করে কোলে তুলে নেয়। পদ্মজা কাঁদছে। তার খুব ভয় লাগছে। বার বার বলছে, ‘মামা আমি বাড়ি যাব।’

হানিফের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। বাড়িতে কেউ নেই। বৃদ্ধ সৎ বাবা কানে শুনে না। পদ্মজা হানিফকে

কিল,ঘুষি দিতে থাকে। সেই সাথে জোরে জোরে কান্না শুরু করে। এভাবে কাঁদলে পাশের বাড়ির যে কেউ চলে আসবে। হানিফের রক্ত টগবগ করছে উত্তেজনায়। সে দ্রুত ওড়না দিয়ে পদ্মজার মুখ, হাত, পা বেঁধে ফেলল। পদ্মজার দু'চোখের পানি হানিফের চোখে লাগেনি। হানিফ ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে। পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছে! সে সিগারেট জ্বালায়। খুব আনন্দ হলে তার সিগারেট টানতে ইচ্ছে হয়। সিগারেট টানতে গিয়ে মাথায় আসে নৃশংস ইচ্ছে। নাক,মুখ দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে সিগারেট দুই আঙ্গুলের মাঝে রেখে

পদ্মজার বাম পায়ের তালুতে চাপ দিয়ে ধরে রাখে।

পদ্মজা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হেমলতা দু'হাতে শক্ত করে মেয়েকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বলল, ' আম্মা, তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার দমটা বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। আমি তোমাকে খুব ডাকছি আম্মা। তুমি আসোনি। '

পদ্মজার কথাগুলো হেমলতার বুক রক্তাক্ত করে দেয়। এ যেন ১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের নৃশংসতা। নিজের চোখে তিনি দেখেছেন

পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতা। হানিফ আর তার দেখা অত্যাচারী পাকিস্তানিদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। হেমলতা নির্বাক,বাকরুদ্ধ। শুধু অনুভব হচ্ছে, তার বুকে পড়ে আদরের পদ্মজা হাউমাউ করে কাঁদছে। সর্বাঙ্গ যেন কাঁপছে। হানিফকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে হাত নিশপিশ করছে। সেদিন একটুর জন্য পদ্মজা ধর্ষণ হয়নি। বাড়িতে সবাই ফিরে এসেছিল। পদ্মজা পোড়া স্থানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়।

বাকিটুকু আর পদ্মজাকে বলতে হয়নি,হেমলতা জানেন। পদ্মজার গা

কাঁপিয়ে জ্বর আসে। একুশ দিন বিছানায় ছিল। ততদিনে হানিফ দেশ ছেড়ে চলে যায়। পদ্মজা ভয়ে, লজ্জায় ঘটনাটি কাউকে বলেনি। পায়ের পোড়া দাগ দেখে যখন হেমলতা প্রশ্ন করেছিল, ‘পা এমনভাবে পুড়ল কি করে?’

পদ্মজা সহজভাবে জবাব দিয়েছিল, ‘ চুলার কাছে গিয়েছিলাম। চুলার লাকড়ির আগায় পা লাগছিল।’

কথাটা পদ্মজা সাজিয়েই রেখেছিল। সাথে অনেক যুক্তি। তাই মিথ্যে বলতে একটুও কাঁপেনি। পুরো ঘটনাটা পদ্মজার বুকে তাজা হয়ে আছে। এই

ছয় বছরে লুকিয়ে কতবার কেঁদেছে সে। সবসময় চুপ করে কোথাও বসে থেকেছে। হেমলতা মেয়ের নিশ্চুপতা দেখে মাথা ঘামাননি। কারণ,পদ্মজা ছোট থেকেই চুপচাপ ছিল। কিন্তু আজ হেমলতার খুব আফসোস হচ্ছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন, তার তিনটা মেয়েই তার কাছে খোলা বইয়ের মতো। চাইলেই পড়া যায়। বিশেষ করে পদ্মজাকে বাড়ির পিছনের নদীর বুক দিয়ে তরতর করে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ টলটলে পানির মতো মনে হতো। যার জীবনে অস্বচ্ছ বলতে কিছু নেই। সবই সাদামাটা, সহজ সরল। অথচ, পদ্মজার জীবনেই

কত বড় দাগ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে! কতবড় ঘটনা লুকিয়ে ছিল! মেয়েরা কথা লুকিয়ে রাখার সীমাহীন ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। কথাটি নিজের মেয়েদের ক্ষেত্রে মাথায়ই আসেনি। পদ্মজা শান্ত হলে হেমলতা বললেন, ‘পা টা দেখি।’

পদ্মজা বাঁ পা বিছানায় তুলল। হেমলতা পদ্মজার পা কোলে নিয়ে পোড়া দাগটা দেখেন মনোযোগ দিয়ে। রক্ত টগবগ করে উঠে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিংস্রতা যেন লুটোপুটি খাচ্ছে।

‘এই পোড়া দাগ হানিফের রক্ত দিয়ে মুছবো।’

কথাটি কত সহজ করে বলেছেন হেমলতা। তবুও পদ্মজা কেঁপে উঠল। কী যেন ছিল কথাটিতে! শরীরের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। হেমলতা বারান্দার রুম ছেড়ে বড় ঘরে ঢুকেন। মিনিট কয়েক পর, রামদা, ছুরি হাতে নিয়ে উঠোনে যান। উঠোনের এক পাশে শক্ত পাথর আছে। ছুরিটা পাথরে ঘষতে থাকলেন সাবধানে। ঘষতে ঘষতে পাথর গরম হয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। মানে ধার হয়ে গেছে। পদ্মজা বারান্দা থেকে দেখছে। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছে। হেমলতা বারান্দা পেরিয়ে রুমে ঢুকতে যাবে তখন পদ্মজা উৎকণ্ঠিত গলায় ডাকল, 'আম্মা!'

‘আন্নার চাচার এক মেয়ে নিখোঁজ শুনেছিস তো বড়দের মুখে? সেই মেয়ের ধর্ষক হানিফ। ধর্ষণের পর পুঁতে ফেলেছে। অলন্দপুরের এই একটা মানুষই এতোটা নৃশংস। আমি তখন ঢাকা পড়তাম। বাড়ি এসে জানতে পারি ঘটনা। আম্মার অনুরোধ আর কান্নায় আমি সেদিন মুখ খুলিনি। এত বড় পাপ চেপে যাই। সেই শাস্তি আমি ধীরে ধীরে পাচ্ছিলাম। আজ পুরোপুরি পেয়ে গেলাম। আমার পাপের শাস্তি শেষ হয়েছে।’

হেমলতা কথা শেষ করে জায়গা ত্যাগ করলেন। কী ধারালো প্রতিটি বাক্য!

হেমলতার মুখ দিয়ে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়ে।

চলবে....